ভক্তিরাগ

ভারতীয় ভক্তিসাধনার ধারায় নারী : লাল দেদ

সুমনা সাহা

নারীর স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের পথ বৈদিকযুগে খোলা থাকলেও মধ্যযুগে সে-অধিকার ক্রমশই সংকুচিত হয়ে এসেছিল। কিন্তু মন? সেখানে যে কোনও শিকল পরানো যায় না! মনের আকাশ যদি ভক্তিমেঘে ছেয়ে যায়, অঝোর বৃষ্টিধারা যদি অন্তরের নিভৃত মহাসাগরের বুকে ঝরে পড়ে, আর তার বিন্দু বিন্দু যদি শুক্তির বুকে মুক্তো হয়ে জন্মায়, তবে সেই মুক্তোর শান্ত সুন্দর দ্যুতি জগৎ অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়। যুগে যুগে সন্তভূমি ভারতের বুকে এভাবেই পবিত্রহৃদয় মহামতি সাধিকারা সমাজের চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম অগ্রাহ্য করে ফুলের মতোই বিকশিত করেছেন তাঁদের জীবন। কঠোর সামাজিক অনুশাসন তাঁদের নিষ্ঠুরতম দণ্ড দিয়েছে, নির্বাসিত করেছে, অপবাদ দিয়েছে, কিন্তু শত লাঞ্ছনা সয়েও অন্তরের গভীরে পরমানন্দের সন্ধান পেয়ে তাঁরা সবকিছু তুচ্ছ করেছেন।

ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরেই বহুবর্ণ বিচিত্র সামাজিক তথা ধর্মীয় সংস্কৃতির মিলনভূমি। জ্ঞান, ভক্তি ও অন্যান্য বহু সাধনমার্গ ও সাধক, তাঁদের সাধনা, তাঁদের জীবন ও উপদেশের ভিত্তিতে রচিত শত শত গ্রন্থ, শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারদের টীকা-টিপ্পনী শত সহস্র নদীর জলধারার মতোই ভারতকে পুষ্ট করেছে। কিন্তু ভক্তিমার্গ ভারতে অন্যান্য সমস্ত মার্গের তুলনায় অনেক বেশি বিকশিত হয়েছে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ভক্তিযোগ যুগধর্ম, তাই যাঁরা ভক্তিপথে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়েছিলেন সেইসব সাধকদের জীবন আলোচনা বর্তমান যুগে অত্যন্ত প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান ও ভক্তির তুলনা টেনে উপমা দিয়েছেন, ''ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানা রূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকারমূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার।'' কী অপূর্ব কথাটি! 'ভক্তি হিম'—ভক্তের কাছে ওই অসাধারণ শক্তিটি আছে, যা দিয়ে সে অরূপকে রূপে দর্শন করতে পারে।

নারীর ক্ষেত্রে 'ভক্তি' একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা পেয়েছে। এখানে 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাসন' খাটেনি, সামাজিক অনুশাসনের বিধিনিষেধের প্রাচীর ভেঙে পড়েছে, বংশানুক্রমিক প্রথায় কঠোর শৃঙ্খল—যা সাধারণত নারীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের নিচুতলার পুরুষও এই অনুশাসনের শিকলে বন্দি হয়েছেন—ভক্তিতে সেই

শিকল যেন আলগা হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে অন্যান্য সব প্রাণীর মতোই আলো-হাওয়া-জলের উপর সমানাধিকারের মতো ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও নারী স্বাধীনতার ফোকর খুঁজে নিয়ে প্রাণভরে শ্বাস নিয়ে বেঁচেছে। তাই জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি সাধনমার্গের তুলনায় ভিন্নতরভাবে ভক্তির পথ প্রথমে 'ভক্তি আন্দোলন' হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'ভক্তি আন্দোলন'-এর সাধিকাদের জীবন পর্যালোচনা করলে বিস্মিত হয়ে দেখি, কী অসামান্য যত্নে তাঁরা অনুশাসনের কঠিন ঋজু রেখাকে নমনীয় করে নিজেদের জন্য অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত একটি পথ তৈরি করে নিয়েছেন, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, লিঙ্গবৈষম্যের প্রশ্নে না গিয়ে এক নতুন আঙ্গিকে ভক্ত-ভগবান সম্পর্কের পুনর্ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ভক্তির সাধনপথে পুরুষ ও নারীর জন্য লেখা হত পৃথক ভাগ্য। মহারাষ্ট্রের সন্ত তুকারাম তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় অগ্রসর হওয়ার পথে স্ত্রীর অসহযোগিতা ও অভিযোগ অগ্রাহ্য করেছেন। বঙ্গে রামপ্রসাদ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ সংসারে থেকেও অসংসারীর মতোই নিজের আধ্যাত্মিক জগতে বিভোর হয়ে থেকেছেন। কিন্তু রাজস্থানের মীরা, কাশ্মীরের লাল্লা কিম্বা কর্ণাটকের মহাদেবী—কারও ক্ষেত্রেই সংসারের ভিতরে থেকে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। স্বামী, শাশুড়ি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের কাছ থেকে অসহযোগিতা, বিরুদ্ধাচরণ এমনকী প্রাণনাশের চেষ্টা, নির্বাসনদণ্ড শেষপর্যন্ত তাঁদের ঘর ছেড়ে পথে নামতে বাধ্য করেছে। অগণিত নারী অন্তরের ভক্তিস্রোতে ভেসে গেলেও সংসারের খুঁটিনাটি কাজে একবিন্দু অবহেলা করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'বড় মানুষের বাড়ির দাসী' হয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে তাঁরা সকল বঞ্চনা-গঞ্জনা হাসিমুখে নীরবে সহ্য করেছেন। দু-চারজন ছাড়া অগণিত সেইসব নারীর কথা ইতিহাসে থাকে না। ভারতের শতসহস্র ভক্তিসাধিকার মধ্যে একজনের সংক্ষিপ্ত অনুধ্যান করব এই নিবন্ধে।

লাল দেদ, লাল্লা লালেশ্বরী, লাল যোগেশ্বরী প্রভৃতি নানা নামে পরিচিতি কাশ্মীরের সন্ত কবি ও শৈবসাধিকার। কেউ তাঁকে 'সুফি' বলেন, কেউ বলেন 'যোগী', কেউ বা এক পূতচরিতা নারী, আবার কারও কারও বিশ্বাস তিনি 'অবতার'। কাশ্মীরে সুপ্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে সমানভাবে মিলেমিশে গেছে বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্ম। কাশ্মীরিদের রক্তে বইছে হিন্দুর সহনশীলতা, বৌদ্ধের দয়া, মুসলমানের প্রাণশক্তি। আজ যে কাশ্মীরে এত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, কলহনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক দলিল 'রাজতরঙ্গিণী'তে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। সেকালে বৌদ্ধ রাজারা হিন্দু মন্দিরের সংস্কার করতেন, হিন্দু রাজারাও অনুরূপ করতেন। কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্বকালে সুলতান জৈন উল আব দিন খাঁটি কাশ্মীরির মতোই শ্রদ্ধা সহকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দির নতুন করে নির্মাণ করিয়েছিলেন, ক্লান্ত ক্ষুধার্ত তীর্থযাত্রীদের জন্য বহু স্থানে 'লঙ্গর' খুলেছিলেন। কাশ্মীর সুফি বিশ্বাসের উর্বর ক্ষেত্র। বহু প্রেমিক সন্ত, কবি ও সুফি সাধকের জন্ম দিয়েছে স্বর্গীয় এই উপত্যকা। উচ্চকোটি মরমিয়া সাধকদের মধ্যে লাল দেদ অন্যতম, যাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাই পরবর্তী খ্যাতনামা সুফি সাধিকা কবি শেখ উল আলম নূর উদ্দিন ওয়ালির এক নগমায়—''পাঁপুর (Pampore)-এর লাল দেদ অন্তিমে পেল যে-দিব্য স্থান, যেখানে পৌঁছে জীব অমর হয়ে যায়, শিবসঙ্গে মিলিত হয়েছে সে পরম মিলনে, হে প্রভু, সেই একই পুরস্কারপ্রার্থী আমার উপরেও তোমার আশিস বর্ষণ করো!"

বহু প্রাচীন কাল থেকে কাশ্মীরি ভাষায় কাব্যসাধনা করলেও এবং সাধক হিসাবে পূজিত হলেও মাত্র দুশো বছর আগে সাধক পণ্ডিত

রাজানন্দ ভাস্কর আচার্য লালেশ্বরীর কাশ্মীরি ভাষায় রচিত ষাটটি শ্লোক সংগ্রহ করে সংস্কৃতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এরপর ১৯২০ সালে, স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন এবং লায়োনেভ ডি বার্নেট স্থানীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে তাঁর ১০৯টি শ্লোক উদ্ধার করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন 'Wise Saying of Lalla Ded' নামে। এরপর লালেশ্বরীর বাণী নিয়ে হিন্দি, উর্দু ও ইংরেজিতে আরম্ভ হয় একাধিক কাজ ও গবেষণা। আনুমানিক ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে লালেশ্বরীর নশ্বর দেহের অবসান হয়। এত বছর পরে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে পাঠক তাঁকে নতুন ভাবে চিনছেন, আবিষ্কার করছেন তাঁর যোগসাধনার উচ্চ তত্ত্ব সম্পৃক্ত বাক। আনুমানিক সাতশো বছরেরও আগে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি তাঁর সহজ-সরল বাকের মধ্য দিয়ে প্রচার করেছিলেন 'জীব-শিব-অভেদ' তত্ত্ব।

লাল দেদ-এর গভীর আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জক পঙ্‌ক্তিগুলি 'লাল বাক' নামে কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ, প্রত্যেক দেশের মানুষ তাঁদের অমর কবিদের সঙ্গে এই বাক-এর মিল খুঁজে পান—ইংরেজরা শেক্সপিয়রের সঙ্গে, জার্মানরা গ্যেটে-র সঙ্গে, বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, ইরানিরা শা-দীর সঙ্গে, পাঞ্জাবিরা ওয়ারিশ শা-এর সঙ্গে এবং কাশ্মীরিরা শেখ উল আলমের সঙ্গে। লাল দেদ-এর জন্মস্থান ও জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে। অনেকে বলেন তাঁর জন্ম অধুনা পাম্ড্রেস্থান-এ, যেটি 'পুরাণাধিষ্ঠান' (অর্থ, প্রাচীন শহর)-এর অপভ্রংশ। তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে, চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনও সময়ে পাঁপুর-এর পাশের গ্রাম সাঁপুর (Sampora)-এ তাঁর জন্ম হয়েছিল। সত্তর-আশি বছর তিনি জীবিত ছিলেন।

লালীশ্বরীর জন্ম ও জীবন নিয়ে লোকমুখে নানা গল্প ও কিংবদন্তি ছড়িয়ে রয়েছে কাশ্মীরের সমগ্র উপত্যকা জুড়ে। এক মতে 'লালীশ্বরী' হয়ে জন্ম নেওয়ার আগে কাশ্মীরেই কোথাও তাঁর জন্ম হয়েছিল, পাম্ড্রেস্থান নগরের এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ও তিনি একটি সন্তানের জন্ম দেন। সেই পরিবারের কুলগুরু সিদ্ধপুরুষ শ্রীকণ্ঠ ছিলেন কাশ্মীরি শৈবমতের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবাস গুপ্ত-র শিষ্য (নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাশ্মীররাজ অবন্তীবর্মার সময়ে)। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার একাদশ দিনে শ্রীকণ্ঠ শুদ্ধি অনুষ্ঠানে এলেন। শিশুসন্তানের মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''এই নবজাত শিশুর সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ?'' শ্রীকণ্ঠ আশ্চর্য হয়ে বললেন, ''এ কী অদ্ভুত প্রশ্ন! এ তোমার সন্তান!'' কিন্তু সেই নারী জোর দিয়ে বললেন, ''না।'' গুরুদেব যখন জানতে চাইলেন, ''তবে এ তোমার কে হয়?'' তার উত্তরে সকলকে অবাক করে দিয়ে ওই নারী বললেন, ''কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মৃত্যু হবে, মারহামা গ্রামে এক ঘোটকীরূপে আমার জন্ম হবে।'' সেই ঘোটকী-দেহে কোন কোন চিহ্ন থাকবে, সে সমস্ত বর্ণনা করে তিনি আরও বললেন, ''যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর জানতে চান, তবে এক বছর পরে মারহামায় আসুন, আমাকে খুঁজে বের করতে পারলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।'' এই বলে ওই নারী তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করলেন। সিদ্ধযোগী কৌতূহলবশত এক বছর পরে ওই গ্রামে গিয়ে অনুরূপ লক্ষণযুক্ত ঘোটকী খুঁজে বের করে সেই প্রশ্নের উত্তর চাইলেন। কিন্তু এবারও উত্তর পেলেন না। ঘোটকী বলল, ''আমি এখনই মারা যাব, বিজবিহারে কুকুরছানা হয়ে জন্ম হবে আমার, একবছর পরে সেখানে এসো, তোমার উত্তর পাবে।'' এই কথা বলা মাত্র ঝোপের ভিতর থেকে একটি বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওই ঘোটকীর উপর এবং সে তৎক্ষণাৎ মারা গেল। সিদ্ধযোগীর কৌতূহল আরও বর্ধিত হল। তিনি একবছর পর বিজবিহার গ্রামে উপস্থিত হলেন এবং আগের মতোই বলে-দেওয়া চিহ্ন মিলিয়ে খুঁজে বের

করলেন সেই কুকুরছানাটিকে। উত্তর না দিয়ে সেটিও মারা গেল। এইভাবে অনেক বছর ঘুরেও তিনি জবাব পেলেন না। অবশেষে ভগ্নমনোরথ হয়ে শ্রীনগর থেকে ১৫ মাইল দূরে অবন্তীপুরা নগরীর কাছে বাস্তারবন পাহাড়ে তিনি তপস্যা করতে গেলেন। এদিকে পাঞ্জ্রেস্থানের যে-পরিবারে সন্তানজন্মের এগারো দিন পরে এক নারীর মৃত্যু হয়েছিল, সেই পরিবারেই তাঁর সপ্তম পুনর্জন্ম হল লালীশ্বরী রূপে। বারো বছর বয়স হলে কুলগুরুর সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁর বিবাহ স্থির হল পাঁপুর নগরের (নবম শতাব্দীতে রাজা অজাতপীড়ার মন্ত্রী পদ্ম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন পদ্মপুর) দ্রাঙ্গাবল মহল্লার এক পণ্ডিত পরিবারে। বিয়ের ঠিক একদিন আগে বাস্তারবন থেকে তপস্যা সম্পূর্ণ করে ফিরে এলেন কুলগুরু সিদ্ধযোগী। তিনিই বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্রীপক্ষের প্রধান পুরোহিত হলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের মাঝেই একান্তে লালীশ্বরী সিদ্ধযোগীর কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, ''আমার গর্ভে যে জন্মেছিল, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ, আপনি বহুবার আমার কাছে যে উত্তর জানতে চেয়েছেন, এখন বলছি, এই পাত্র অর্থাৎ আমার স্বামীই আমার সেই সন্তান।'' যোগীর মনে সমস্ত স্মৃতি উদিত হল, তিনি চমকিত হলেন। বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। পাত্রের পিতা লাল-এর নাম রাখলেন পদ্মাবতী। পত্নীবিয়োগ হওয়ার পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। লালীশ্বরীর শাশুড়ির অর্থাৎ তাঁর স্বামীর সৎ মায়ের অত্যাচারে নববিবাহিত দম্পতি ঈশ্বরের অমোঘ ইচ্ছাতেই কোনওদিন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একসঙ্গে থাকতে পারেননি। নববধূর উপর নির্যাতনের নব নব কৌশল প্রয়োগ করতেন শাশুড়ি। কোনও অভিযোগ না করে নীরবে তিতিক্ষার পরীক্ষা দিয়ে চলেছিলেন লালেশ্বরী। ভাতের থালায় প্রতিদিন একটি বড় পাথর রেখে তার ওপর ভাত ছড়িয়ে বউমাকে খেতে দিতেন শাশুড়ি। আর সবাইকে ডেকে দেখাতেন—নতুন বউ কত ভাত খায় দেখে যাও। লালী মুখটি বুজে খেয়ে নিতেন আর সকলের অলক্ষে পাথরটি ধুয়ে শাশুড়িকে ফেরত দিতেন। একটানা বারো বছর শাশুড়ির এরকম সব বিচিত্র অত্যাচার সয়ে আসছিলেন লালেশ্বরী। কাউকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেননি। একদিন একটু অন্যরকম ঘটনা ঘটে গেল। গ্রহশান্তির জন্য বাড়িতে একটি পুজোর আয়োজন করা হল, বলির জন্য নিয়ে আসা হল একটি নধর ভেড়া। এক প্রতিবেশিনী ঠাট্টার ছলে বলল, ''আজ রাত্রে তোর ভোজের সুখাদ্য জুটবে!'' লালীর মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, ''হুন্দ মারিতান্ কিনাহ্ কাথ নোশি নালবাত সালিহ্ নাহ্ যাহ্!'' অর্থ, যজ্ঞে বড় কিংবা ছোট যেমন পশুবলিই হোক না কেন, পুত্রবধূর থালায় পাথরই দেওয়া হবে। লালীর শ্বশুরের কানে গেল একথা। স্ত্রী যখন লালীশ্বরীর খাবারের থালা নিয়ে আসছিলেন, সত্যমিথ্যা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর হাত থেকে তিনি ছিনিয়ে নিলেন থালাটি, আর সত্যিই ভাতের পাতলা স্তরের নিচে রাখা পাথর দেখলেন। তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হলেন, বধূমাতার সঙ্গে এহেন নিষ্ঠুর আচরণ করার জন্য স্ত্রীকে অনেক তিরস্কার করলেন। শাশুড়ি ভাবলেন, পদ্মাবতী নির্ঘাত স্বামীর কাছে তাঁর নামে নালিশ করেছে। তাই অত্যাচারের মাত্রা আগের থেকে আরও বেড়ে গেল। সৎ ছেলেকে তিনি বউ-এর বিরুদ্ধে ক্রমাগত উসকাতে লাগলেন : ''বউ নদীতে জল আনতে যায়, অনেক দেরি করে ফেরে, কী করে কে জানে?'' ইত্যাদি। নদীর অপর পারে ছিল নট কেশব ভৈরবের মন্দির। আজন্ম শিব-অনুরাগিণী লালীশ্বরী কাউকে কিছু না বলে নদী পার হয়ে ওপারে মন্দিরে চলে যেতেন কখনও সখনও। তাঁর মনকে দুদণ্ড শান্তি দিত শিবমন্দিরের পবিত্র আবহ। কুটিলতায় ভরা সংসারের মলিনভাব

ধুয়ে ফেলে জল নিয়ে আবার ফিরে আসতেন। পরবর্তী কালে তাঁর বাক্-এ প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা, যেখানে দেখি জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দর্শনে তথাগত বুদ্ধের সংসার-বিরাগের অনুরণন—

''প্রবল হাওয়ার বেগ যেমন একটা পাতাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, একজন জ্ঞানী মানুষকেও আমি ক্ষুধায় ঠিক ততটাই বিবশ হয়ে যেতে দেখেছি, সময়মতো রান্না করেনি বলে তিনি তাঁর রাঁধুনিকে নির্বোধ মূর্খের মতো প্রহার করছিলেন। লাল্লা সেদিন থেকেই এই সংসারের ফাঁদ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতীক্ষায়।''

কিন্তু সংসারের কোনও কাজে তাঁর একান্ত নিষ্ঠার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। পদ্মের মৃণালের তন্তু থেকে সুতো বের করে সেই সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে চরকায় কাপড় বুনতেন, নদী থেকে ঘড়া ঘড়া জল বয়ে আনতেন, রান্না ও অন্যান্য গৃহস্থালির কাজ তো ছিলই। কিন্তু কিছুতেই শাশুড়ি সন্তুষ্ট হতেন না। সৎ মায়ের মুখে দিবারাত্রি লাল্লার চরিত্র সম্বন্ধে অকথা-কুকথা শুনতে শুনতে তাঁর স্বামীও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলেন। একদিন জল নিয়ে ঘরে ফিরে আসতেই শুরু হল জেরা, কেন এত দেরি হয়? সৎ মায়ের আদেশে ক্রুদ্ধ স্বামী লাল্লার মাথার ঘড়া লাঠির আঘাতে ভেঙে ফেললেন। কিন্তু সকলে আশ্চর্য হয়ে প্রত্যক্ষ করল এক অলৌকিক দৃশ্য! এক ফোঁটা জলও মাটিতে পড়ল না, লাল্লার মাথায় কলসির আকারেই তা জমে রইল। লাল্লা ধীরে ধীরে ঘরের সমস্ত শূন্য পাত্র জলপূর্ণ করলেন, বাকি জল ছিটিয়ে দিলেন দ্বারে, সেখানে বইতে লাগল এক জলের নালা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও নাকি সেই নালাটি জলপূর্ণ ছিল, বর্তমানে শুকিয়ে গেছে। প্রাচীন ঘরদোর কিছুই আর নেই। সেদিনের পর থেকে শাশুড়ি ভয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু বিদ্যুদ্বেগে এই ঘটনা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে রাতারাতি লাল্লা গ্রামের লোকের চোখে হয়ে গেলেন 'দেবী'। দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করল তাঁর আশীর্বাদ নিতে। নীরবতা-প্রেমী অন্তর্মুখ লাল্লার অন্তরে ভগবৎপ্রেমের আগুন তো কবে থেকেই ধিকিধিকি জ্বলছিল, এবার এই নতুন অত্যাচার তাঁর আর সহ্য হল না। তীব্র বৈরাগ্যে তিনি ছিঁড়ে ফেললেন পরনের কাপড়, মর্যাদাহীন বৈবাহিক বন্ধন থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে মুক্ত করে গান গাইতে গাইতে শিবপ্রেমে উন্মাদিনী লাল্লা ঘরের আবেষ্টনী থেকে পথে নামলেন। বললেন—

''হৃদয়ে যেদিন ধারণ করেছি
আমার গুরুর বাণী :
'বাহিরের থেকে ভিতরে ফেরাও
দৃষ্টিপ্রদীপখানি,
একাগ্র হও আপন হৃদয় কন্দরে',
লাল্লা একথা রোপণ করেছে অন্তরে।
সেইদিন থেকে লোকলাজ আমি ভুলেছি।
উন্মাদ আমি পথে পথে নেচে ফিরেছি।''

সিদ্ধযোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাধনায় ডুব দিলেন লাল্লা। যোগীর আস্তানা পাঁপুরের নাম্বালবাল মহল্লায়, তার কাছেই একটি গুহায় লাল্লা দীর্ঘকাল তপস্যা করেছেন। সেই গুহাটি বর্তমানে না থাকলেও যে-ঘাটে লাল্লা স্নান করতেন, সেই ঘাটটি 'সিদ্ধ ইয়ার' নামে প্রসিদ্ধ এবং অমরনাথ তীর্থযাত্রীরা আজও এই পবিত্র ঘাটে স্নান করেন।

যোগদর্শনের উচ্চতম তত্ত্বকে কাশ্মীরি ভাষায় লাল্লা তাঁর 'বাক্'-এ সহজ সরল দোঁহার মাধ্যমে প্রচার করেছেন :

''জড়িয়ে জ্ঞানের উত্তরীয়
লাল্লার বাক প্রাণে গেঁথে নিয়ো,
আত্মজ্যোতিতে আপনা হারাবে
তবেই তুমিও মুক্তি পাবে।''

মানুষ তাঁকে ভালবেসে লালি, লাল্লা, লাল দেদ (আদরের দাদি মা), যোগেশ্বরী, যোগিনী,

সিদ্ধযোগিনী প্রভৃতি নানা নামে ডেকেছে। তাঁর বাক সংক্ষিপ্ত, বাস্তবোচিত, সহজবোধ্য, মধুর, প্রেরণাদায়ক ও গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তথা নৈতিক আদর্শে পরিপূর্ণ। কাশ্মীরি সাহিত্যে লাল্লার বাক হীরে-মোতির মতোই উজ্জ্বল, দ্যুতিময়, স্নিগ্ধকিরণ। লাল্লার বাক দ্ব্যর্থক—কবিতা হিসাবেও তার রসাস্বাদন করা যায়, আবার তাতে আধ্যাত্মিক সাধনা ও উপলব্ধির গভীর ব্যঞ্জনাও লুকিয়ে আছে : ''আমার হৃদয়ের মল্লিকা বাগানের দ্বার পেরিয়ে এলাম, দেখলাম শিব-শক্তি প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ! আনন্দ-মদিরা পান করে আমি নিজেকে ছুঁড়ে ফেললাম সুধাহ্রদে, আর জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম। সেদিন থেকে আমি মৃতের মতো চলে ফিরে বেড়াচ্ছি, কেউ জানে না এ-জগৎসংসারে লাল্লা মরে গেছে।''

অহংমদে মত্ত অজ্ঞান মানুষ সম্পর্কে লাল্লার উক্তি :

''ঐশানী মেঘ মোর ইচ্ছায়,
হতে পারে খান খান,
সারিয়ে তুলব জটিল ব্যাধি
জলধি করব পান।
তপের প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব যদি করি,
মূঢ় ব্যক্তির মনটি তথাপি বদলাতে নাহি পারি।''

তীব্র তপস্যাময় সমগ্র জীবনে লালেশ্বরী ঘটিয়েছেন অজস্র অলৌকিক ঘটনা, মানুষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে সচল শিবতুল্য লালাকে দেবীর মতো পুজো করেছে, তবুও মুক্তি যে ছেলের হাতের মোয়া নয়, ভবনদী পার হতে গেলে লাগে পারানির কড়ি, অর্থাৎ সাধন-ভজন-ত্যাগ-তপস্যা, সেকথাটি বোঝাবার জন্যই বুঝি লাল্লা গাইলেন—

''হাটের পথে এলেম নদীর তটে,
ঘাটে থাকি তরীর অপেক্ষায়
আসবে কখন পারাপারের নেয়ে,
হাটের মাঝে ফিরব না যে আর।
সঞ্চয় মোর নাই যে কানাকড়ি,
কোন মূল্যে উঠব তোমার নায়ে
দিন ফুরাল, রাত্রি খসে পড়ে,
আধেক পথে থাকি প্রতীক্ষায়।'' ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। Anand Koul, *Lalla Vakyani and Life Sketch of Lalla Yogeshwari*, Digitized by eGangotri, Kashmir Research Institute, Srinagar

২। Joyalal Koul, *Lal Ded* (Hindi), English translation by : Shivan Krishna Raina.

৩। Nil Kanth Kotru, *Lal Ded : Her Life and Sayings*, Utpal publications, Srinagar, 1989

লাল্লা বাক ইংরেজি থেকে বাংলায় স্বাধীন অনুবাদ করেছেন লেখক।

নিবোধত কার্যালয়ের ছুটির বিজ্ঞপ্তি

২—৫ অক্টোবর, ২০২২ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে।
৯ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে।
২৪ অক্টোবর কালীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় অর্ধদিবস বন্ধ থাকবে।
২ ও ৩ নভেম্বর জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে।